আপন গান

সুভাষ চৌধুরী

রবীন্দ্রসংগীতের শ্রেষ্ঠ রূপকার স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। সত্যদ্রষ্টা পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ বালকপুত্র রবীন্দ্রনাথের গান শুনে বলতেন 'রবি আমাদের বাংলাদেশের বুলবুল'। প্রথম প্রথম পরিজন-পরিবেশে গান শোনাতেন রবীন্দ্রনাথ। কালে কালে গানের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল। সভাসমিতিতে ভাষণ বা প্রবন্ধপাঠের পর সর্বত্রই শ্রোতাদের অনুরোধে শোনাতে হত গান, নিজের লেখা গান--- যে গানের মধ্যে 'সঞ্চিত হয়েছে দিনে দিনে / সৃষ্টির প্রথম রহস্য, আলোকের প্রকাশ, / আর সৃষ্টির শেষ রহস্য, ভালোবাসার অমৃত'।

কেমন ছিল তাঁর গান গাওয়া-- 'যখন একলার কণ্ঠস্বরে আকাশ কেঁপে উঠত।' প্রিয় শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথের কথায় তাঁর রবিকাকার গানে ছিল 'একলা মানুষের কণ্ঠে হাজার পাখির গান।'

আর সেই সব গান! নিজের কাছে, নিজের গানের সুরে বাঁধা স্বয়ং স্রষ্টার কথায় 'গানটা শুনলেই হয়ে যায়। এই সুরগুলি কারো কাছে ধার করা নয়। কোথা থেকে এসেছে, বলতে পারি নে। আপনার ইচ্ছেমতো গলায় এসেছে, পেয়েছিও, গান হয়ে উঠেছে। তাই শুনি যখন, বিস্মিত হই এবং আমি নিজেকে বলি-- তোমার গান রইল, এ আর কাল অপহরণ করতে পারবে না।'

রবীন্দ্রনাথ-রচিত অজস্র গানের ভেতর থেকে তুলে আনা দশটি অনুপম গানের সৃজনবেদনার মুহূর্ত আর রূপসৃষ্টি স্মৃতির উজ্জ্বল অনুষঙ্গের নিদর্শন

শান্তিনিকেতন আশ্রমের প্রথম যুগের ছাত্র প্রমথনাথ বিশীর স্মৃতিতে ধরা আছে এমনি একটি গানের, স্মৃতির মুহূর্ত--- 'তখন আশ্রমের গ্রীষ্মাবকাশ প্রায় শেষের দিকে; আকাশ নূতন বর্ষার মেঘে ঘন নীল, কিছু আগেই এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে, তখনো গাছের পাতা হইতে জল ঝরিতেছে। রবীন্দ্রনাথ থাকিতেন আশ্রমের পশ্চিম প্রান্তের একটি বাংলোতে। আমি আমবাগানের মধ্য দিয়া কোথাও যাইতেছিলাম, হঠাৎ দেখিলাম রবীন্দ্রনাথ সবেগে আসিতেছেন; এতই ত্বরা যে, পথ দিয়া চলিবার সময় নাই বলিয়াই মাঠ ভাঙিয়া চলিয়াছেন; মাঠ ভাঙিয়া সম্মুখেই পড়িল মেহেদি গাছের বেড়া, তাহা অগ্রাহ্য করিয়া ঠেলিয়া আসিলেন; অদূরে দাঁড়াইয়া শুনিলাম গুন গুন করিয়া গানের দুটি পদ আবৃত্তি করিতেছেন; ভ্রমর যেথায় হয় বিবাগি নিভৃত নীলপদ্ম লাগি! ব্যাপার কী বুঝিতে বিলম্ব হইল না। এই গানটি তখনি রচনা করিয়া সুর দিয়াছেন; ভুলিয়া যাইবার আগেই দিনেন্দ্রনাথকে শিখাইয়া দিবার জন্যে ছুটিয়া চলিয়াছেন। দিনুবাবু তখন থাকিতেন দেহলিবাড়িতে। পথ দিয়া ঘুরিয়া যাইতে যেটুকু সময় বেশি লাগিবে, সেটুকু সময়ের মধ্যে হয়তো সুরের ভ্রান্তি ঘটিতে পারে।

তাঁহার গায়ে ছিল লম্বা বর্ষাতি; তাহাতে জল ঝরিতেছে; হাতে ছাতিটা বন্ধ; হয়তো পথে খুলিয়াছেন, কিন্তু গাছের ডালপালায় বাধিয়া গিয়াছিল, তাই বন্ধ করিয়াছেন; কিম্বা হয়তো খুলিবার কথা আদৌ মনে হয় নাই। ফলকথা তাঁহার এমন মত্তভাব আর কখনো দেখি নাই। উদাসীন দৃষ্টি সেই নিভৃত নীল পদ্মের দিকে বন্ধ, দেহটা অভ্যাসের বশে ছুটিয়া চলিয়াছে। প্রাচীন কাব্যে মত্ত গজরাজের পদ্মবন ভাঙিয়া চলিবার কথা পড়িয়াছি; এতদিন এই চিত্রটাকে কবিদের একটা কৃত্রিম অলংকারমাত্র মনে হইত। কিন্তু সেদিন নরশ্রেষ্ঠের এই ত্বরিত গতি দেখিয়া আমার মনে ঐ উপমাটা এক মুহূর্তে দ্যোতনায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। তাঁহার স্বাভাবিক দীর্ঘাকৃতি সেদিন জল-ঝরা বর্ষাতির আবরণে দীর্ঘতর মনে হইতেছিল। সবশুদ্ধ মিলিয়া সে যেন এক আবির্ভাব।'

আমি কান পেতে রই

রবীন্দ্র-অনুরাগী অমল হোম তাঁর স্মৃতিচারণে লিখছেন 'গ্রীষ্মের শান্তিনিকেতনে সারাটা দিন দিনেন্দ্রনাথের 'বেণুকুঞ্জে' গানে-গল্পে আড্ডা জমিয়েছি কালিদাস নাগ আর আমি। বৈকালিক চা-পর্ব সবে শেষ হয়েছে, এমন সময়ে ঘোর কালবৈশাখী মেঘে ছেয়ে গেল আকাশ।... দিগদিগন্ত ধুলোয় ঢেকে ছুটে এল ঝড়। আমরা দেখছি দাঁড়িয়ে বারান্দায়। হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন-- 'ঐ দ্যাখো, রবিদা আসছেন।' দেখি, সেই ঝড়ের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ ছুটে আসছেন--- তাঁর বেশবাস, তাঁর শ্মশ্রু কেশ উড়ছে, জোববাটাকে চেপে ধরেছেন বাঁহাতে, আর ডান হাতে চেপে ধরেছেন চোখের চশমাটা।.... আরেকটু এগিয়ে আসতেই শুনতে পেলাম গলা ছেড়ে তিনি গাইছেন--- মেঘমন্দ্রের সঙ্গে তাঁর কণ্ঠ উঠছে গর্জে---
যেতে যেতে একলা পথে নিবেছে মোর বাতি....
বারান্দাতে উঠেই বললেন--- 'দিনু এই নে' ... ঘরে এসে বসে পড়লেন দিনেন্দ্রনাথ ফরাসে।... তারপর নামল বৃষ্টি মুষলধারে--- আর নামল অজস্র ধারায় কবির ও দিনেন্দ্রনাথের গান। সেদিন খুলে গিয়েছিল কবির কণ্ঠ।'
যেতে যেতে একলা পথে

১৯১৪-র গ্রীষ্মে রবীন্দ্রনাথ রামগড় পাহাড়ে সদ্যঃক্রীত বাড়ি 'হৈমন্তী'-তে উঠলেন। সেখানে ক্রমে ক্রমে উপস্থিত হলেন রথীন্দ্রনাথ দিনেন্দ্রনাথ প্রমুখ। রবীন্দ্রনাথ সেই সুখস্মৃতির কথায় জানিয়েছেন সবচেয়ে জমিয়ে দিল গান। গায়কের ত্র্যহস্পর্শ--- এক জায়গায় বাবা, অতুলপ্রসাদ ও দিনেন্দ্রনাথ।... মনে পড়ে এক দিন অতুলপ্রসাদ বাবাকে অনুরোধ করলেন--- 'আপনি কাল যে সুরটি গুনগুন করছিলেন আপনার ঘরে , আমার বড়ো ভালো লাগছিল শুনতে, গান বাঁধা নিশ্চয়ই হয়ে গেছে, ওই গানটি আমাদের শুনিয়ে দিন।' বাবা বললেন 'সেটা যে দিনুকে এখনো শেখানো হয় নি, তা হলে আমাকেই গাইতে হয়।' বাবা গাইলেন,'এই লভিনু সঙ্গ তব, সুন্দর হে সুন্দর।' .... শুনতে শুনতে অতুলপ্রসাদ অভিভূত হয়ে পড়লেন, বাবাকে গানটি বার বার গাইতে বললেন। যতবার গাওয়া হয় তাঁর কিছুতেই তৃপ্তি হয় না, আর একবার শোনবার জন্যে আকুল হয়ে পড়েন।'
....'বাবার তখনো গান গাইবার গলা ছিল। ঘরের বাইরে উন্মুক্ত আকাশের নীচে বসে গাইতেন, তাঁর কণ্ঠস্বরে গাছপালা পাহাড় যেন কেঁপে উঠত।'
এই লভিনু সঙ্গ তব

রবীন্দ্রনাথ তৃতীয়বার বিদেশযাত্রা করলেন ২৭ মে ১৯১২। কয়েকমাস ইংলন্ডে থাকার পর অক্টোবর মাসে আমেরিকা যাত্রা করলেন। সঙ্গী ছিলেন পুত্র রথীন্দ্রনাথ পুত্রবধূ প্রতিমা দেবী এবং ড. দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র। তিনি লিখছেন 'আমরা একসঙ্গে আমেরিকা যাচ্ছি.... কবি ও আমি এক ক্যাবিনে.... তখন ইংরাজী গীতাঞ্জলী প্রকাশিত হয় নি; কবি য়ুরোপ ও আমেরিকার একরকম অজ্ঞাত বললেই হয়।.... রাত্রি তখন অনেক--- ভোরের কাছাকাছি--- পৌনে ৪টা। অশান্ত মহাসাগরের দোলানির চোটে ঘুম ভেঙ্গে গেল। চেয়ে দেখি ঘরের অপর দিকে, Portholeবা গোল জানলার দিকে সমুদ্রের ধারেই, কৌচের উপর বসে কবি গুন্‌গুন্‌ করে গাইছেন। যে-দৃশ্য দেখ্‌লাম জীবনে তা' চিরস্মরণীয়। তাঁর যে অনিন্দ্যসুন্দর মুখের উপর জানালা থেকে আলোর আভা এসে পড়েছে; তিনি উপাসনার আসনে আসীন। গাইছেন
এই তো তোমার প্রেম
গান শেষ হ'লে কতক্ষণ রইলেন স্তব্ধ, নীরব। আবার গুন্‌গুন্‌ করতে করতে আর এক সংগীত উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল।'
এই তো তোমার প্রেম ওগো

অমল হোমের স্মৃতিতে ধরা আছে আরো একটি গানের সৃজন মুহূর্ত। তিনি লিখছেন 'সবচেয়ে বেশি মনে পড়ে একটি রাতের কথা।... অনেক বছর আগেকার কথা। শান্তিনিকেতনে গিয়েছি অগ্রজপ্রতিম পরলোকগত চা বন্দ্যোপাধ্যায় মশায়ের সঙ্গে। কবি আছেন তখন মহর্ষির তৈরি শান্তিনিকেতনের সেই আদি ভবনে--- এখন যার নাম হয়েছে 'old Guest

House'। খাওয়া-দাওয়ার পর বেশ খানিকটা রাত্রি পর্যন্ত কবির গল্প শুনে শুয়ে পড়েছি। তিনি শুয়েছেন দোতলার সিঁড়ি দিয়ে উঠে, বাঁদিকের ছোট ঘরটিতে-- বরাবরই তাঁর পছন্দ ছিল ছোট ঘর!--- তাঁর পাশের বড় ঘরটিতে আছি চাবাবু ও আমি। কতক্ষণ ঘুমিয়েছি জানি না, হঠাৎ 'চাদা' আমার ঘুম ভাঙিয়ে বললেন--- 'অমল, শুনছো?' শুনলাম কবির কণ্ঠ-- সুরালাপ করছেন। উঠে দেখি, বসন্তের চাঁদের আলোয় শান্তিনিকেতনে দিগন্তবিস্তারী প্রান্তর প্লাবিত; গাড়ি-বারান্দার ছ াদে একটা সাদা পাথরের বড় জলচৌকির উপর বসে রবীন্দ্রনাথ গান করছেন। চাদা আর আমি পা টিপে টিপে এসে চুপি চুপি বসে পড়লাম কবির পিছনে। একটু পরেই বুঝতে পারলাম সুরের আলাপের সঙ্গে সঙ্গে কথা বসিয়ে হচ্ছে নতুন গ ানের সৃষ্টি-- আজ জ্যোৎস্নরাতে সবাই গেছে বনে।... সুরের নীহারিকাপুঞ্জ থেকে বেরিয়ে এল একটি পরিপূর্ণ জ্যোতির্ময় নক্ষত্র।... আমি যে সময়ের কথা বলছি তখন নিরন্তর সংগীতসৃষ্টির আনন্দে তাঁর দিনরাত্রি উঠতো উদ্বেল হয়ে।'

আজ জ্যোৎস্নারাতে সবাই গেছে বনে

পুত্র রথীন্দ্রনাথের সুখস্মৃতিতে এসেছে বার বার গায়ক রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গ। তাঁর 'শিলাইদহের স্মৃতি'-তে রয়েছে এমনি একটি দিনের ছবি 'লেখার ফাঁকে ফাঁকে যখন বাবাকে গান পেয়ে বসত-অমলাদিদিকে কলকাতা থেকে নিয়ে আসতেন। দিনের বেলায় অমলাদিদি মায়ের সঙ্গে রান্না নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন।... সন্ধে হলেই অন্য-সব কাজ ফেলে গান শোনবার জন্য সবাই সমবেত হতেন। মাঝিরা জলিবোটটা বজরার গায়ে বেঁধে দিয়ে যেত। তাড়াতাড়ি খাওয়া সেরে জানলা দিয়ে টপকে সেই বোটটাতে গিয়ে বসতুম। সুরেনদাদার হাতে এসরাজ থাকত। জলিবোট খুলে মাঝদরিয়ায় নিয়ে গিয়ে নোঙর ফেলে রাখা হত। তারপর শু হত গান--- পালা করে বাবা ও অমলদিদি গানের পর গান গাইতে থাকতেন। আকাশের সীমান্ত পর্যন্ত অবারিত জলরাশি, গানের সুরগুলি তার উপর দিয়ে ঢেউ খেলিয়া গিয়ে কোন্ সুদূরে যেন মিলিয়ে যেত, আবার ওপারের গাছপালার ধাক্কা খেয়ে তার মৃদু প্রতিধবনি আমাদের কাছে ফিরে আসত।... সে- সব রাত আজ স্বপ্নের মতো মনে হয়, কিন্তু আজও যখন

বেলা গেল তোমার পথ চেয়ে.....

তুমি সন্ধ্যার মেঘমালা, তুমি আমার সাধের সাধনা....

প্রভৃতি গান শুনি, সেই-সব রাত্রির কথা মনে পড়ে যায়--- যে রাত্রে গানের সুর জলের কলধবনি ও ফুরফুরে দক্ষিণে হ াওয়ার সঙ্গে এক হয়ে যেত, যে রাত্রে চাঁদের আলোর বন্যায় নদীর জলে ও নদীর চরে অপূর্ব এক ইন্দ্রজালের সৃষ্টি করত।

তুমি সন্ধ্যার মেঘমালা

১৯৩৭-এর ২০ নভেম্বর তারিখের একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ পুলিনবিহারী সেনকে লিখছেন

'আর-একদিনের ঘটনা মনে পড়ছে, সে বহুদিন পূর্বের কথা
তখনকার দিনে আমাদের রাষ্ট্রনায়কদের অঞ্জলি তোলা ছিল
রাজপ্রাসাদের দুর্গম উচচশিখর থেকে প্রসাদকণাবর্ষণের
প্রত্যাশায়। একদা কোনো জায়গায় তাঁদের কয়েকজনের সান্ধ্য
বৈঠক বসবার কথা ছিল। আমার প্রবল অসম্মতি সত্ত্বেও তিনি
বারবার করে বলতে লাগলেন আমি না গেলে আসর জমবে
না। শেষ পর্যন্ত ন্যায্য অসম্মতিকেও বলবৎ রাখবার শক্তি
বিধাতা আমাকে দেন নি। যেতে হল । ঠিক যাবার পূর্বক্ষণেই
আমি.... রচনা করেছিলাম--- 'আমায় বোলো না গাহিতে'
ইত্যাদি। এই গান গাবার পরে আর আসর জমল না। সভাস্থগণ
খুশি হন নি।

আমায় বোলো না গাহিতে

রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্মৃতিকথায় জানাচ্ছেন 'একদিন আমার রচিত দুইটি পারমার্থিক কবিতা শ্রীকণ্ঠবাবুর নিকট শুনিয়া পিতৃদেব হাসিয়াছিলেন। তাহার পরে বড়ো বয়সে আর-একদিন আমি তাহার শোধ লইতে পারিয়াছিলাম।.... একবার মাঘোৎসবে সকালে ও বিকালে আমি অনেকগুলি গান তৈরি করিয়াছিলাম। তাহার মধ্যে একটা গান---- 'নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে, রয়েছ নয়নে নয়নে।'

পিতা তখন চুঁচুড়ায় ছিলেন। সেখানে আমার এবং জ্যোতিদাদার ডাক পড়িল। হারমোনিয়ামে জ্যোতিদাদাকে বসাইয়া আমাকে তিনি নূতন গান সবকটি একে একে গাহিতে বলিলেন। কোনো কোনো গান দুবারও গাহিতে হইল।

গান গাওয়া যখন শেষ হইল তখন তিনি বলিলেন, ''দেশের রাজা যদি দেশের ভাষা জানিত ও সাহিত্যের আদর বুঝিত, তবে কবিকে তো তাহারা পুরস্কার দিত। রাজার দিক হইতে যখন তাহার কোনো সম্ভাবনা নাই তখন আমাকেই সে-কাজ করিতে হইবে।'' এই বলিয়া তিনি একখানি পাঁচ-শ টাকার চেক আমার হাতে দিলেন।

নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে

১০ জুলাই ১৮৯৬ রবীন্দ্রনাথ একটি চিঠিতে তাঁর প্রিয় একটি গান রচনার কথা জানিয়েছেন ''বড়ো বেদনার মতো'' গানের সুরটা ঠিক হয়তো মজলিসি বৈঠকি নয়।..... এসব গান যেন একটু নিরালায় গাবার মতো। সুরটা যে মন্দ হয়েছে এমন আমার বিশ্বাস নয়, এমনকি ভালো হয়েছে বললে খুব বেশী অত্যুক্তি হয় না। ও গানটা আমি নাবার ঘরে অনেকদিন একটু একটু করে সুরের সঙ্গে তৈরি করেছিলুম--- নাবার ঘরে গান তৈরি করবার ভারী কতকগুলি সুবিধা আছে। প্রথমত নিরালা, দ্বিতীয়ত অন্য কোনো কর্তব্যের কোনো দাবি থাকে না--- মাথায় এক টিন জল ঢেলে পাঁচ মিনিট গুনগুন করলে কর্তব্যজ্ঞানে বিশেষ আঘাত লাগে না। সবচেয়ে সুবিধা হচ্ছে কোনো দর্শকসম্ভাবনা মাত্র না থাকাতে সমস্ত মন খুলে মুখভঙ্গি করা যায়। মুখভঙ্গি না করলে গান তৈরি করবার পুরো অবস্থাটা আসে না।... এ গানটা আমি এখনও সর্বদা গেয়ে থাকি--- আজ প্রাতঃকালেও অনেকক্ষণ গুনগুন করেছি, গাইতে গাইতে গভীর একটা ভাবোন্মাদও জন্মায়।

বড়ো বেদনার মতো

রবীন্দ্রনাথ লিখছেন 'আমার চবিবশ বছর বয়সের সময় মৃত্যুর সঙ্গে যে পরিচয় হইল তাহা স্থায়ী পরিচয়। তাহা তাহার পরবর্তী প্রত্যেক বিচ্ছেদশোকের সঙ্গে মিলিয়া অশ্রুর মালা দীর্ঘ করিয়া গাঁথিয়া চলিয়াছে।' এই মৃত্যু রবীন্দ্রনাথের নতুন বৌঠান কাদম্বরী দেবীর আত্মহত্যা ১৯ এপ্রিল ১৮৮৪ সন। তিনি লিখছেন 'জীবনের মধ্যে কোথাও যে কিছুমাত্র ফাঁক আছে, তখন তাহা জানিতাম না; সমস্তই হাসিকান্নায় একেবারে নিরেট করিয়া বোনা। তাহাকে অতিক্রম করিয়া আর কিছুই দেখা যাইত না, তাই তাহাকে একেবারে চরম করিয়াই গ্রহণ করিয়াছিলাম। এমন সময় কোথা হইতে মৃত্যু আসিয়া এই অত্যন্ত প্রত্যক্ষ জীবনটার একটা প্রান্ত যখন এক মুহূর্তের মধ্যে ফাঁক করিয়া দিল, তখন মনটার মধ্যে কী ধাঁধাই লাগিয়া গেল। চারি দিকে গাছপালা মাটিজল চন্দ্রসূর্য গ্রহতারা তেমনি নিশ্চিত সত্যেরই মতো বিরাজ করিতেছে, অথচ তাহাদেরই মাঝখানে তাহাদেরই মতো যাহা নিশ্চিত সত্য ছিল--- এমন-কি, দেহ প্রাণ হৃদয় মনের সহস্রবিধ স্পর্শের দ্বারা যাহাকে তাহাদের সকলের চেয়েই বেশি সত্য করিয়াই অনুভব করিতাম সেই নিকটের মানুষ যখন এত সহজেই এক নিমিষে স্বপ্নের মতো মিলাইয়া গেল তখন সমস্ত জগতের দিকে চাহিয়া মনে হইতে লাগিল, এ কী অদ্ভুত আত্মখণ্ডন! যাহা আছে এবং যাহা রহিল না, এই উভয়ের মধ্যে কোনোমতে মিল করিব কেমন করিয়া!'

দীর্ঘকাল পরেও এই ঘটনার রেশ রয়ে গিয়েছিল তাঁর মনে। রানী চন্দকে বলেছিলেন 'নতুন বৌঠান মারা গেলেন, কী বেদনা বাজল বুকে। মনে আছে সে সময়ে আমি গভীর রাত পর্যন্ত ছাদে পায়চারি করেছি আর আকাশের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে বলেছি, 'কোথায় তুমি নতুন বৌঠান', 'কোথায় তুমি নতুন বৌঠান', একবার এসে আমায় দেখা দাও।' কতদিন এমন হয়েছে-- সারারাত এভাবে কেটেছে। সেই সময়ে আমি এই গানটাই বেশি গেয়েছি, আমার বড়ো প্রিয় গান।'

আমার প্রাণের পরে, চলে গেল কে।

सृष्टिसन्धान

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com